E-CONTENT PREPARED BY

Dr. Shreya Ray

Assistant Professor

Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(***Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal***)

NAACAccredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours (Semester- II) in Bengali

Name of Course: বাংলা ভাষার ইতিহাস

Topic of the E-Content:
বাংলা ভাষা ও উপভাষা

- **ভাষা** – মানব মনের বিবিধ ভাবপ্রকাশের তাগিদ থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল । ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্র থেকে নির্গত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি । ভাষার সংজ্ঞা নিরুপন করতে গিয়ে আচার্য সুকুমার সেন জানিয়েছিলেন , ' মানুষের উচ্চারিত , অর্থবহ , বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা' । অর্থাৎ তাঁর মতে , ভাষা শুধু মানুষের বাগযন্ত্র থেকে উচ্চারিত হলেই হয় না, বা শুধু অর্থবহন করলেই হয় না , তাকে অবশ্যই হতে হবে বহুজনবোধ্য ।

  তাছাড়া ধ্বনিগুচ্ছ ব্যাবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম বিন্যাস আছে যাকে আমরা ব্যাকরণ বলি । এই ব্যাকরণের নিয়ম মেনেই ধ্বনিগুচ্ছ বাক্য তৈরি করে ও বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে তৈরি হয় ভাষা । সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' -এ ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে – 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য , বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন , কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যাবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে সুপ্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।'

  ভাষার সঙ্গে সমাজের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে । আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কএর কথা ব্যাখ্যা করেছে । কেননা প্রতিটি ভাষাই এক একটি বিশেষ জনসমাজে প্রচলিত ।অই বিশেষ ভষার মাধ্যমে অই জনগোষ্ঠীর মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে থাকে । আবার একটি বিশেষ ভাষা অঞ্চলের মধ্যে সর্বত্র একই প্রকারের ভাষা ব্যাবহার হয় না । অঞ্চলগত ভেদে ধ্বনিগত ও রূপগত বেশ কিছু পার্থক্য তৈরি হয়ে যায় । এর ফলে সৃষ্টি হয় আঞ্চলিক উপভাষার ।

- **উপভাষা** – মূল ভাষা অঞ্চলের একটি বিশেষ অংশে প্রচলিত ও ব্যাবহৃত ভাষা , যার সঙ্গে মূল ভাষাটির ধ্বনিগত ও রূপগত স্পষ্ট পার্থক্য আছে , কিন্তু সেই পার্থক্য কখনই এতটা বেশি নয় যে, তা একটা পৃথক ভাষা হয়ে উঠতে পারে ; একই ভাষার অন্তর্গত এই পৃথক রূপ আঞ্চলিক উপভাষা নামে পরিচিত । যেমন , বাংলা ভাষার পাঁচটি আঞ্চলিক উপভাষা আছে , সেগুলি হল – রাঢ়ী , বঙ্গালী , বরেন্দ্রী ,ঝাড়খন্ডী ও কামরূপী বা রাজবংশী ।

- **ভাষা ও উপভাষার পার্থক্যঃ**

  ১. মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টি ভাষা । যেমন – বাংলা একটি ভাষা । আবার একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে । যেমন – রাঢ়ী , বঙ্গালী , বরেন্দ্রী ইত্যাদি হল বাংলা ভাষার উপভাষা ।

  ২. ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত । উপভষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত ।

৩. ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শ রূপ আছে । সাহিত্যে , শিক্ষায় , আইন আদালতে, বক্তৃতায় , বেতার সংবাদ পত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করা হয়। আর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজের নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে ।

৪. ভাষার মধ্য দিয়ে সেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি উঠে আসে । উপভাষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক সংস্কৃতি উঠে আসে।

- <u>বাংলা উপভাষাঃ</u>

ভাষাতত্ত্ববিদরা বাংলা কথ্য উপভাষার প্রধান পাঁচটি ভাগের কথা বলেছেন । যথা – রাঢ়ী , বঙ্গালী , বরেন্দ্রী , ঝাড়খন্ডী ,কামরূপী বা রাজবংশী । এই উপভাষা গুলির ভৌগলিক এলাকা মোটামুটি নিম্নরূপ –

উপভাষা	অঞ্চল ও বিস্তৃতি
রাঢ়ী	পূর্বরাঢ়ী- কলকাতা, ২৪ পরগণা ,হাওড়া, বর্ধমান(পূর্ব) পশ্চিমরাঢ়ী- পূর্ব বাকুঁড়া, হুগলী, বীরভুম, পশ্চিম বর্ধমান উত্তররাঢ়ী- নদীয়া, মুর্শিদাবাদ দক্ষিণরাঢ়ী- উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর , দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অংশ
বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অংশ – ঢাকা , মৈমনসিংহ,ফরিদপুর,বরিশাল,খুলনা,যশোর,নোয়াখালি,চট্টগ্রাম

বরেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ- মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর রাজশাহী,পাবনা
ঝাড়খন্ডি	দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম অংশ, পুরুলিয়া, মানভুম, সিংভুম, ধলভুম প্রভৃতি অঞ্চল
কামরূপী বা রাজবংশী	কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, জল্পাইগুড়ি, কাছাড়, ত্রিপুরা, রংপুর, শ্রীহট্ট

বঙ্গের (এবং আসাম ও ঝাড়খণ্ডের কিছু জেলার) একটি মানচিত্র যাতে বাংলার উপভাষাগুলো দেখানো হয়েছে।[1]

রাঢ়ী উপভাষা
বঙ্গালী উপভাষা
ঝাড়খণ্ডী উপভাষা
বরেন্দ্রী উপভাষা
সুন্দরবনী উপভাষা
***রাজবংশী উপভাষা**
***সিলেটী উপভাষা**
***চাঁটগাঁইয়া উপভাষা**

*(****মোটা অক্ষর*** *চিহ্নিত উপভাষাগুলি শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচয়ে উপভাষা হিসেবে স্বীকৃত। অনেকে সিলেটী ও চাঁটগাঁইয়া কে ভিন্ন ভাষা বলে মনে করেন।)*

- রাঢ়ী উপভাষাঃ

বাংলাভাষার যে পাঁচটি উপভাষা আছে তার মধ্যে রাঢ়ী উপভাষার বিস্তৃতি সব থেকে বেশি ।আদর্শ বাংলা হিসেবে যে রূপটি প্রচলিত তার উৎসমূলেও রয়েছে রাঢ়ী উপভাষা। অঞ্চলগত বিচারে রাঢ়ী উপভাষার বিস্তৃতি বেশি হওয়ায় এর কতকগুলি উপবিভাগও দেখা যায় । যেমন – পূর্বরাঢ়ী, পশ্চিমরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী । পূর্বরাঢ়ীর মধ্যে পড়ে কলকাতা, ২৪ পরগণা ,হাওড়া, বর্ধমান(পূর্ব) । এই উপবিভাগ থেকেই শিষ্ট চলিত বাংলা তথা আদর্শ বাংলা গদ্যের উদ্ভব । পশ্চিমরাঢ়ীর মধ্যে পড়ে পূর্ব বাকুঁড়া, হুগলী, বীরভুম, পশ্চিম বর্ধমান জেলা। উত্তররাঢ়ীর মধ্যে পড়ে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলা। দক্ষিণরাঢ়ীর মধ্যে পড়ে উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর , দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশ ।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অভিশ্রুতি প্রবনতা । যেমন- করিয়া>কইর্যা >করে, কালি > কাইল>কাল প্রভৃতি।

২. স্বরসঙ্গতি রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । যেমন –বুনা>বোনা, শুনা>শোনা, বিলাতি>বিলিতি প্রভৃতি।

৩. রাঢ়ী উপভাষায় ‘অ’ ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে ‘ও’ তে পরিনত হয়েছে । ‘ই’, ’উ’, ‘ক্ষ’ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পুর্ববর্তি ‘অ’ এর উচ্চারন হয়েছে ‘ও’ এর মত । যেমন- অতি>(ওতি), মধু>(মোধু), সত্য>(সোত্যো)। তাছাড়া অন্যত্রও ‘অ’ ধ্বনি ‘ও’ ধ্বনিতে পরিনত হয়েছে । যেমন – মন> (মোন), বন>(বোন) প্রভৃতি।

৪. নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেতে দেখা যায় । যেখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়েছে । যেমন – চন্দ্র > চাঁদ , বন্ধ > বাঁধ প্রভৃতি ।

৫. স্বতোনাসিক্যিভবনও ঘটেছে কোথাও কোথাও । যেমন – পুথি> পুঁথি , হাসপাতাল> হাঁসপাতাল প্রভৃতি ।

৬. ‘ল’ ধ্বনি অনেক্সময় ‘ন’ তে পরিনত হয়েছে । যেমন – লৌহ > নোয়া , লবণ > নুন প্রভৃতি ।

৭.মধ্যস্বর লোপের প্রবনতাও রয়েছে ।যেমন – গামোছা> গামছা , জানালা> জানলা প্রভৃতি ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. রাঢ়ী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে – ‘গুলি’ , গুলো, প্রভৃতি বিভক্তি বসে । কিন্তু অন্য কারকের ক্ষেত্রে বহুবচনে –‘দের’ বিভক্তি বসে। যেমন –

কর্তৃকারক- ছেলেগুলি কাজের , আমগুলো মিষ্টি ইত্যাদি ।

কর্মকারক- আমাদের ভাত দাও।

করণকারক- তোদের দিয়ে পড়শুনা হবে না।

২. রাঢ়ী উপভাষায় গৌণকর্মকারকে ‘কে’ বিভক্তি বসে। কিন্তু মুখ্য কর্মকারকে কোনো বিভক্তি বসে না । যেমন – ছেলেটাকে(গৌণকর্ম) একটা লজেন্স(মুখ্যকর্ম) দাও।

৩. রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরন কারকে –‘এ’, ‘তে’, ‘এতে’ বিভক্তি বসে । যেমন –

‘-এ’- ঘরে দজ্জাল বউ।

‘-তে’ – বাড়িতে হাজার লোক।

‘-এতে’- ধানেতে পাক এসেছে।

৪. করন কারকে অনুসর্গ বসে ‘দিয়ে’, ‘সঙ্গে’, ‘সাথে’ । অপাদান কারকে অনুসর্গ বসে “থেকে’,’হতে’,’চেয়ে’ প্রভৃতি। যেমন- তোমাকে দিয়ে এই কাজটা হবে। গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরছে।

৫. এই উপভাষায় বর্তমাঙ্কালে পুরুষ বিভক্তি বসে এইরূপ –

উত্তম্পুরুষ- ‘ই’ বিভক্তি – আমি কাজ করি, বইও পড়ি ।

মধ্যমপুরূষ- ‘অ’,’ও’ – তুমি কাজ কর। তোমরা বোসো।

প্রথমপুরুষ- ‘এ’,’এন’,’ন’ বিভক্তি – সে কাজ করে। তিনি যান।

৬. অতীতকালের ক্রিয়ার বিভক্তি বসে নিম্নরূপ-

উত্তমপুরুষ- ‘-উম’,’-আম’ – আমি করেছিলাম, আমি বল্লুম।

মধ্যম পুরুষ- ‘-এ’,’-ই’,’-এন’ – তুমি করেছিলে।তুই করেছিলি। আপনি করেছিলেন ।

প্রথম পুরুষ- সে কাজ করেছিল।তিনি কাজ করেছিলেন ।

৭. ভবিষ্যত কালে বিভক্তি বসে নিম্নরূপ –

উত্তমপুরুষ - ‘-ব’,’-বো’ – আমি কাজ করব।

মধ্যম পুরুষ- ‘-বে’, ‘-বি’, ‘-বেন’ – তুমি কাজ করবে।তুই কাজ করবি। আপনি কাজ করবেন ।

প্রথম পুরুষ- ‘-বে’,’-বেন’ – সে করবে। তিনি করবেন।

রাঢ়ী উপভাষার নিদর্শনঃ

‘একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি বাপকে বললে- বাবা আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো , তা আমাকে দিন।‘

বঙ্গালী উপভাষাঃ

পূর্ববাংলার প্রধান উপভাষা বঙ্গালী । মূলত পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অংশ – ঢাকা , মৈমনসিংহ,ফরিদপুর,বরিশাল,খুলনা,যশোর,নোয়াখালি,চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই উপভষা প্রচলিতপ।

- ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. এর প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতি। যেমন – করিয়া>কইর‌্যা , কালি>কাইল, আজি>আইজ।

২. রাঢ়ী উপভাষায় নাসিক্যব্যঞ্জন সাধারনত লোপ পায়।কিন্তু অঙ্গালীতে পায় না। যেমন – চন্দ্র>চান্দ।

৩. ‘এ’ ধ্বনি ‘অ্যা’ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন – দেশ> দ্যাশ, কেশ> ক্যাশ, তেল>ত্যাল প্রভৃতি।

৪. ‘ও’ ধ্বই অনেক্সময় ‘উ’ ধ্বনিতে পরিনত হয়েছে । যেমন – দোষ> দুষ, কোদাল>কুদাল।

৫. ঘোষ মহাপ্রান ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রানে পরিনত হয়েছে। যেমন – ভাই>বাই , ঘর>গর।

৬. ‘চ’ এর উচ্চারন হয়েছে ‘ৎ’’ এর মত । ‘ছ’ এর উচ্চারন ‘স’ এর মত। যেমন – খেয়েছে> খাইসে, গাছ>গাস ।

৭. ‘শ’ এবং ‘স’ স্থলে ‘হ’ উচ্চারিত হয় । সকলে>হগলে, শালা>হালা ।

৮. শব্দের আদি বা মধ্যে অবস্থিত ‘হ’ ধ্বনি ‘অ’ ধ্বনিতে পরিনত হয়েছে। যেমন – হয়>অয় , হতভাগা> অতভাগা ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. কর্তৃকারকে ব্যাপকভাবে ‘-এ’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – রামে খায়, মায়ে ডাকে।

২. গৌণকর্মকারক ও সম্প্রদান কারকে ‘-রে’ বিভক্তি বসে । যেমন – আমারে বাত দ্যাও।

৩. অধিকরণকারকে –‘ত’ বিভক্তি বসে । যেমন – বাড়িত থাকুম না ।

৪. করন কারকে –এ’ বিভক্তির সঙ্গে ‘দিয়া’ , ‘লগে’ প্রভৃতি অনুসর্গ যুক্ত হয় । যেমন – তরে দিয়া কাজ হইব না ।

৫. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে -‘গো’ বিভক্তি হয় । যেমন – আমাগো খাইতে দিবা না?

৬. সাধারন ভবিষ্যত কালে পুরুষ অনুসারে বিভক্তি বসে ‘ যেমন –

উত্তম পুরুসঃ –‘উ’ – আমি খামু।

-‘উম’ – আমি খেলুম না।

-‘ম’/-‘বাম’ – পাইবাম।

মধ্যম পুরুসঃ –‘বা’ – তুমি বুঝবা না।

প্রথম পুরুসঃ –‘বা’/-‘ব’ – সে যাইব না ।

৭. বঙ্গালির ঘটমান বর্তমানের রূপ রাঢ়ীর সাধারন বর্তমানের মত । যেমন – মায়ে ডাকে ক্যান ।

৮. বঙ্গালির পুরাঘটিত বর্তমানের রূপ রাঢ়ীর পুরাঘটিত বর্তমানের মত । যেমন – আমি করসি।

বঙ্গালি উপভাষার নিদর্শন ঃ-

‘ কইলকাতার কিনার দিয়া বড় একখানা খাল চইলা গ্যাসে । হেইডার নাম গঙ্গা । এই নিকি নদী !’

ঝাড়খন্ডী উপভাষআঃ

ঝাড়খন্ডী উপভাষা মুলত পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর , পুরুলিয়া , দক্ষিণ ও পশ্চিম বাকুড়া , সিংভুম , মানভুম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১.ঝাড়খন্ডি উপভাষায় অনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রচুর ব্যাবহার দেখা যায় । যেমন – আঁটা , বাঁসা চাঁ ইত্যাদি ।

২. ‘ওঃ’ ধ্বনির পরিবর্তে ‘অ’ ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে । যেমন – দোকান > দকান , গোটা > গটা , মোটা > মটা ইত্যাদি ।

৩. অপিনিহিতি জাত বা বিপর্যাসের ফলে প্রাপ্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ থেকে গেছে এই উপভাষায় । পরবর্তী পর্যায় অভিশ্রুতি ঘটে না ।

৪.অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণে পরিনত হবার প্রবণতা দেখা যায় । যেমন – দূর > ধূর , তোকে > তখে ইত্যাদি ।

৫. স্বরসঙ্গতি প্রবনতা খুবই কম । তাই ধূলা , মূলা, শিয়াল, বিড়াল, হিসাব প্রভৃতি শব্দের অপরিবর্তিত প্রয়োগ দেখা যায় ।

৬. ‘ল’ এবং ‘ন’ এর বিপর্যস্ত ব্যবহার দেখা যায় । যেমন – নাতি > লাতি , লেবু > নেবু , লুচি> নুচি প্রভৃতি ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১.ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় বসে । যেমন – খাবেক নাই? যাবেক নাই?

২. নাম ধাতুর প্রচুর ব্যাবহার দেখা যায় । যেমন – হামার ঘরে চর সাঁদাইছিল ।

৩. ঝাড়খন্ডি উপভাষায় নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি বসে । যেমন – জলকে চল ।

৪. সম্বন্ধ পদে শূণ্য বিভক্তি বসে । যেমন – ঝাড়গাঁ ধুতি বুঢ়া মনে নাই লাগে ।

৫.. অপাদান কারকের বিভক্তি –'নু' , -'লে' । যেমন – মায়ের লে মাউসির দরদ ।

৬. 'আছ' ধাতুর বদলে 'বট' ধাতুর প্রয়োগ হয় । যেমন – কে বটে লোকটি ?

৭. অধিকরন কারকে 'এ' , 'কে' বিভক্তি বসে । যেমন – রাইতকে ভারি জড়াবেক।

৮. না সুচক বাক্যে নঙর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে । যেমন – চুনটুক কেনে নাই দিলি ?

ঝাড়খন্ডী ভাষার নিদর্শন ঃ

জামবনির লে বীরেনের শালা আঁইসেছে। যেমন কাড়ি হক উ হাঁপসাই দিবেক ।আর গতসালে বইল না । গাঁইয়ের ছেল্যাগুলা কুথার লে একটা মাতালকে ধইরে আইনল।

বরেন্দ্রী উপভাষাঃ

বরেন্দ্রী উপভাষা মুলত উত্তরবঙ্গে প্রচলিত । পশ্চিমবঙ্গের মালদা , দক্ষিণ দিনাগপুর, এবং বর্তমান বাংলাদেশের রাজস্হাহী , পাবনা , ওঃ বগুড়া জেলায় এই উপভাষা প্রচলিত । প্রাচীঙ্কালে এই সমস্ত অঞ্চল বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত ।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় রাঢ়ীর মতই অনুনাসিক স্বরধ্বনি রক্ষিত হয়েছে । যেমন – চাঁদ , বাঁধ , ইঁট ইত্যাদি ।

২. ঘোষ মহাপ্রান ধ্বনি আদিতে রক্ষিত হলেও অন্ত্য ওঃ মধ্যে অবস্থিত হলে প্রায়ি অল্পপ্রানে পরিনত হতে দেখা যায় । যেমন – বাঘ> বাগ।

৩. অন্যান্য স্বরধ্বনি অপরিবর্তিত থাকলেও অনেক সময় 'এ' ধ্বনি অ্যা' তে পরিনত হয়। যেমন – দিল্যান , দ্যান প্রভৃতি ।

৪. বঙ্গালীর প্রভাবে 'জ'(j) > 'জ' (z)/ ঝ এর মত উচ্চারিত হয় । যেমন – জন > ঝন/জন(zan) ।

৫. শব্দের আদিতে ‘র’ এর আগম ওঃ লোপ দুই ই হতে দেখা যায় । যেমন – রাস্তা> আস্তা , আম> রাম ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১.এই উপভাষায় অধিকরন কারকে অনেকসময় ‘ত’ বিভক্তি বসে ।যেমন – বাড়িত, বুকত ইত্যাদি ।

২. কর্তৃকারকের বহুবচনে –‘গুলি’, -‘গিলাআ’ বিভক্তি বসে । আবার কখন – ‘গলা’/’গলান’ বিভক্তি ওঃ বসে । যেমন – বান্দর গিলা। রামগলান ফেলে দে ।

৩. কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য কারকের বহুবচনে –‘দের’ বিভক্তি বসে । যেমন – মাইয়াদের ।

৪. সম্বধনে অনেক্সময় ‘গে’ শব্দের ব্যাবহার হয় । যেমন – মা গে খেতে দে।

৫. গৌণ কর্মকারকে –‘কে’ বা –‘ক’ বিভক্তি বসে । যেমন – হামাক দ্যাও।

নিদর্শনঃ

হতভাগা ছুয়াগলান । হামি কহনু আমবাবুদের রামবাগানে চল ।

কামরূপী উপভাষাঃ

এই উপভাষা প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, জল্পাইগুড়ি, ॑সামের কাছাড়, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের রংপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. শব্দের আদিতে অবস্থিত ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রান ধ্বনিতে পরিনত হয়েছে । যেমন – লোভ > লোব , বুধ > বুদ ইত্যাদি ।

২. বঙ্গালির মত ব্যাপকভাবে অপিনিহিতি হয় না।

৩. ‘ন’ অ ‘ল’ এর বিপর্যস্ত ব্যাবহার দেখা যায় । যেমন – লাল > নাল , জননী > জলনী ।

৪. শব্দের আদিতে অবস্থিত ‘অ’ কখন কখন ‘আ’ তে পরিনত হয়েছে । যেমন – অতি> আতি, কথা> কাথা ইত্যাদি।

৫. স্বতঃনাসিক্যিভবন দেখা যায় । যেমন – উহা > উঁইয়া , ইহা > ইঁইয়া ইত্যাদি ।

রূপতাত্বিক বৈশীষ্ট্য ঃ

১. গৌণোকর্মকারকে –‘ক’ বিভক্তি বসে । যেমন – হামাক বাত দ্যাও ।

২. অপাদান কারকে থাকি অনুসর্গ বসে । যেমন – ঘর থাকি ।

৩. সবমন্ধ পদে –‘ক’, ‘র’ বিভক্তি বসে । যেম – বাপোক বাড়ি ।

৪. অধিকরন কারকে ‘ত’ ভিভক্তি বসে । যেমন – ঘরত যামু ।

৫. সমাপিকা ক্রিয়ার পুর্বেই নঙ্গর্থক অব্যয় বসতে দেখা যায় । যেমন – না লেখিম।

একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী একই ভাবপ্রকাশের জন্য যখন একই ভাবে, একই রকম ধ্বনি গুচ্ছ ব্যবহার করে, তখন তাকে একটি ভাষা রূপে গণ্য করা হয়। যে ভৌগোলিক পরিসীমার মানুষ একই ভাষা ব্যবহার করে তাকে বলা হয় ভাষাপরিধি। ভাষা পরিধি যদি বিস্তৃত হয়, তাহলে এক প্রান্তের ভাষার সঙ্গে অন্য প্রান্তের ভাষার যোগাযোগ থাকে না। দুই প্রান্তের ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত ও রূপগত পার্থক্য ঘটে যায়। একই ভাষা পরিধির অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ভাষার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মিয়ে যায়। মূল ভাষার থেকে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট এই যে বিশেষ অঞ্চলের ভাষা, একেই বলা হয় উপভাষা। অর্থাৎ, দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে ভাষার মধ্যে উপভাষা গড়ে ওঠে। ভাষার সঙ্গে উপভাষার পার্থক্য আপেক্ষিক এবং কখনই চূড়ান্ত নয়। এই পার্থক্য চূড়ান্ত হয়ে উঠলে উপভাষা গুলিই ভাষার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। আসলে, একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা থাকে, ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলিকে উপভাষা বলা হবে। যখন তা পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা অতিক্রম করবে, তখন তাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলেই গণ্য করা যাবে।

সহায়ক গ্রন্থঃ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ড. রামেশ্বর শ'

-